হাসান আজিজুল হক
শ্রেষ্ঠ গল্প

সম্পাদনা

অনিল আচার্য

দেবকুমার সোম

অনুষ্টুপ

অনুষ্টুপ প্রকাশনী

২ই নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা ৭০০০০৯

সূচি

শকুন ৩৫
একজন চরিত্রহীনের স্বপক্ষে ৪৬
তৃষ্ণা ৫৯
উত্তর বসন্তে ৭২
বিমর্ষ রাত্রি : প্রথম প্রহর ৮৫
মন তার শঙ্খিনী ১০১
গুণিন ১১৮
পরবাসী ১৩০
সারা দুপুর ১৪৪
উটপাখি ১৫৪
আত্মজা ও একটি করবী গাছ ১৬৮
আমৃত্যু আজীবন ১৭৮
খাঁচা ২০৪
শোণিত সেতু ২২০
জীবন ঘষে আগুন ২৪৮
ভূষণের একদিন ২৮২
নামহীন গোত্রহীন ২৯৩
আটক ৩০৪
কেউ আসেনি ৩১৪
ফেরা ৩২৬

সাক্ষাৎকার ৩৩৭
পাতালে হাসপাতালে ৩৪৭
খনন ৩৭৬
হাওয়া নেই ৩৯৪
মাটির তলার মাটি ৪০৮
দূরবাসী ৪১৯
পাবলিক সার্ভেন্ট ৪২৬
রোদে যাব ৪৪৫
খুব ছোট্ট নিরাপদ নির্জন ৪৫২
সম্মেলন ৪৬৫
মা-মেয়ের সংসার ৪৭৬
বিলি ব্যবস্থা ৪৮৯
মানুষটা খুন হয়ে যাচ্ছে ৪৯৭
জননী ৫০৬
বিধবাদের কথা ৫১৫
রফি ৫৬০
ভূত ৫৬৬
দুন্দুভি বেজে ওঠে দ্রিম দ্রিম রবে ৫৭০
ফুলি, বাঘ ও শিয়াল ৫৭৫
একটি নির্জলা কথা ৫৮৫
দূরবিনের নিকট-দূর ৫৯৩
ভূতের ভবিষ্যৎ ৬০৮
পরিশিষ্ট ৬২১

শকুন

কয়েকটি ছেলে বসেছিল সন্ধ্যার পর। তেঁতুল গাছটার দিকে পিছন ফিরে। খালি গায়ে ময়লা হাফশার্টকে আসন করে। গোল হয়ে পা ছড়িয়ে গল্প করছিল। একটা আর্তনাদের মতো শব্দে সবাই ফিরে তাকাল। তেঁতুলগাছের একটা শুকনো ডাল নাড়িয়ে, পাতা ঝরিয়ে, সোঁ-সোঁ শব্দে একটা বিরাট কিছু উড়ে এল ওদের মাথার ওপর। ফিকে অন্ধকারের মধ্যে গভীর নিকষ একতাল সজীব অন্ধকারের মতো প্রায় ওদের মাথা ছুঁয়ে সামনের পোড়ো ভিটেটায় নামল জিনিসটা।

হইচই করে উঠল ছেলেরা, ছুটে এল ভিটেটার কাছে। আবছা অন্ধকারে খানিকটা উঁচু মাটি আর অন্ধকার একটা ঝোপ ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ল না তাদের। কিন্তু ওদের সর্দার ছেলেটি বুঝতে পারল হামেশা দেখা যায় এমন পাখিদের মধ্যে শকুনই তীব্রবেগে মাটিতে নেমে তাল সামলানোর জন্য খানিকটা দৌড়ে যায়। তাই তার চোখেই প্রথম পড়ল অন্ধকারের তালটা দৌড়োতে দৌড়োতে খানিকটা এগিয়ে বিব্রত, হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে গেল।

অপেক্ষাকৃত ছোট ছেলেটি বলল ভয়চকিত স্বরে। কী রে ওটো? আর একজন জবাব দিল, মুটেই বুঝতে পারচি না।

পাখি ওটো।

পাখি-টাখি হবে।

ক্যা জানে, সঞ্জেব্যালায় ক্যার মনে কী আচে? সে বুকে থুথু দিল। অনড় হয়ে রয়েছে অন্ধকারের দলাটা। লুকিয়ে যাওয়ার একটা ভাব, পারলে কোনো বহু পুরোনো বটের কোটরে, কোনো নোংরা পুরীষের গন্ধের বিকট অবাসে, কোনো নদীর তীরে চেনাঝোপের নিচে শেয়ালের তৈরি গর্তে লুকিয়ে যাওয়ার মতলব।

শ্যালা। ক্যার মনে কী আচে, ক্যা কী চায়, ক্যার ভ্যাকে ক্যা আসে। চ বাড়ি যাই।

দলের মধ্যে গোরু চরানো রাখাল আছে। স্কুলের ছাত্র আছে। স্কুলের ছাত্র অথচ সুযোগ পেলেই গোরু চরায়, ঘাস কাটে, বীজ বোনে এমন ছেলেও আছে।

তু তো ভীতু, দ্যাখলাম একটো জিনিস, শ্যাষ পর্যন্ত দেখি দাঁড়া।

না, আমি চলে যাবো।

তু যা গা তবে, আমরা যাবো না।

ক্যারে বাড়ি যেচিস, তেঁতুলতলাটা পার হয়ে মজা দ্যাখগা। স্কুলে পড়ে সেই ছেলেটি বলল, জিনিসটো দেখতে হবে।

প্রায় সবাই দাঁড়িয়ে গেল। তারপর বড়ো ছেলেটা এগিয়ে গেল। অতি সন্তর্পণে পা টিপে টিপে।

এক জায়গায় নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সমস্ত সুন্দর জিনিসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মতো সেই কুৎসিত জীবটা।

সর্দার ছেলেটি জানত, সেটা একটা বুড়ো শকুনি। নির্বাক, নিরুদ্যম, নিরুৎসাহ।

একেবারে কাছে এগিয়ে গেল সে। এত কাছে যে হাত বাড়ালে ধরা যায়।

শ্যালা, ক্যার মনে কী আচে, ক্যার ভ্যাকে ক্যা আসে—রাখালটা তখনও বিড়বিড় করছে।

একটা দমকা বাতাসে অজস্র শুকনো পাতা ঝরে পড়ল। পুকুরের পানিতে প্রথমে মৃদু কম্পন, তারপর আস্তে আস্তে ঢেউ উঠল—কার হাত থেকে কোথায় ধাতব কিছু পড়ে বিশ্রী অস্বস্তিদায়ক একটা শব্দ হল।

ছেলেটা একদম কাছে গিয়ে দাঁড়াল, দেখল সত্যিকারেই সেটা একটা শকুনি—আলো থাকতে থাকতে বাসায় ফিরতে পারেনি। এখন রাতকানা। বিকট উগ্র একটা দুর্গন্ধ ওর নাকে এল—ভাগাড়ের আঁশটে গন্ধ মাখানো, গলিত জন্তুর শবদেহের পচা পাঁকে সে যেন এইমাত্র স্নান করে এসেছে। শকুনি-কুকুরে লড়াইয়ের শেষচিহ্ন এখনো একটা ছিটকে বেরিয়ে আসা মোটা খসখসে, নোংরা পালক থেকে টের পাওয়া যায়।